গুরুমূর্তি শ্রীশ্রীমা

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

গুরুবাদ ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নিয়ে কত কাহিনিই না প্রচলিত আছে। গুরুকে হতে হবে বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, আর শিষ্যকে হতে হবে পবিত্র, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু ও অধ্যবসায়ী। গুরু তাঁর অধ্যাত্মসম্পদের বীজ রোপণ করেন শিষ্যের মন-রূপ জমিতে। সেখানে শিষ্যের বহু জন্মের সংস্কাররূপ আগাছাকে তুলে আবাদযোগ্য করতে শেখান পরম মমতায়। সে-শিক্ষা শ্রদ্ধাবান শিষ্য নিজের জীবন দিয়ে ফলবান করে তুলেছেন, এমন কত মহান জীবন আমরা পেয়েছি।

এবারে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যবিহীন লীলা। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন আড়ম্বরহীন সাজে, সাধারণ মানুষের বেশে। সঙ্গে এনেছেন মহাশক্তিময়ী জগজ্জননীকে অবগুণ্ঠনবতী করে। এই লীলায় গুরু-শিষ্যের প্রচলিত কোনও প্রথাই খুঁজে পাওয়া যায় না। গুরুকরণের আগে গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎ, পরস্পরের জানা-চেনার এক সম্বন্ধ স্থাপন বা গুরুসকাশে সমিৎপাণি শিষ্যের উপস্থিতি—এমন কোনও কিছুরই আবশ্যকতা শ্রীশ্রীমা এবং তাঁর সন্তানদের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। মাটির ঘরে জননীর সবকিছুই সাধারণের থেকেও সাধারণ এবং তাতেই তিনি অসাধারণ। এক্ষেত্রে যেমন ঐশ্বর্যের লেশ নেই তেমনই নেই কোনও বিধিনিষেধের বেড়া। তাই কৃপাময়ী জননী রেলস্টেশনে একটুকরো ঘাসের ওপর বসে কুলি-সন্তানকে মহামন্ত্র দান করে তার চৈতন্য জাগ্রত করে দেন অনায়াসে।

জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শক্তি শ্রীসারদা দেবীর স্বরূপটি জগতের সামনে তুলে ধরেছিলেন গুটিকয়েক বাক্যে। ‘‘ও সারদা সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।’’ ‘‘এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।’’ বাস্তবিকই পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমায়ের গুরুশক্তি প্রকটিত হয়েছে ব্যাপকতর আকারে। তার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল নহবতেই। শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেরা রাতে জপধ্যান করবেন বলে যখন তাদের রুটির সংখ্যা ঠিক করে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তখন মা অবলীলায় সে-সংখ্যাকে উপেক্ষা করেছেন। জগৎ শুনেছে মায়ের মুখ থেকে বড় বেশি রকমের ভরসার বাণী : ‘‘ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন, তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।’’[১] শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম জেনেও সেদিন তাঁর বাক্যকে উপেক্ষা করে মা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন,

শ্রীরামকৃষ্ণের কাজের ভার গ্রহণ করা তাঁর কাছে অনায়াসসাধ্য।

এবারে যেন সব কিছুই আলাদা। প্রাচীন গুরুগৃহের সেই নিয়মনিষ্ঠাপূর্ণ কঠোর জীবন বা তৎসহ প্রয়োজনীয় স্বাধ্যায় বা আর যা-যা, তেমন কোনও কিছুই এযুগে মানুষকে করতে হল না। কারণ জ্ঞানদাত্রী গুরুর কঠোরতার আবরণ এবারে একেবারে নেই বললেই চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-উত্তম, মধ্যম বা অধম বৈদ্যের কথা বলেছেন এখানে তেমন কোনও শ্রেণিতেও তাঁকে ফেলা যায় না। তাঁর একটাই পরিচয়, তিনি মা। দেবী চণ্ডীর মধ্যে দেবতারা একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা। এবারে জননীর চিত্তে শুধুই কৃপা। জীবের সংস্কার-অসুর ধ্বংস করলেও নিষ্ঠুরতা কোথাও নেই। তাই সন্তানও অবলীলায় এসেছে, গুরুসেবার পরিবর্তে নিজেরাই জননীর কাছ থেকে প্রাণ-মন হরণকরা আদর-যত্ন, সেবা গ্রহণ করে ভবনদীর পারের কড়িটি লাভ করে ফিরে গেছে। শুনে গেছে মায়ের আশ্বাসবাণী, ''ভয় নেই, এই তোমার জন্মান্তর হয়ে গেল। জন্মান্তরে যত কিছু করেছিলে, সব আমি নিয়ে নিলুম। এখন তুমি পবিত্র, কোন পাপ নেই।''[২]

ভগবান যখন গুরুমূর্তিতে জীবকে উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হন, তখন কত জীবই না হেলায়-ফেলায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তাদের কাছে ঈশ্বরদর্শন, আত্মোপলব্ধি আর কল্পনার বিষয় হয়ে থাকে না। শ্রীগুরুর অভয়পদে আশ্রয় নিয়ে 'আমি মুক্ত' এ-বোধ কত সহজে তাদের হয়ে যায়। ঈশ্বরের রূপ দর্শন করে, কখনও বা আত্মার দর্শন লাভ করে কতজনের জীবন কৃতার্থ হয়ে যায়। যাঁর হাতে মুক্তির চাবি, তিনি যে যাকে-তাকে শ্রীপদে আশ্রয় দিয়ে বলবেন—''এই তোমার শেষ জন্ম''[৩] তাতে আর আশ্চর্য কী? অনেক কামনা-বাসনা নিয়ে এসেও মায়ের মুখে সন্তান শুনে গেছে, ''তা হোক শেষকালে তা থাকবে না।''[৪] কেউ বা মায়ের কাছে আসা মাত্রই শুনেছে, ''কত জন্মজন্মান্তর ঘুরে ঘুরে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছে গেছ।''[৫]

আচার্য শংকর বলেছেন (বিবেকচূড়ামণি),

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং কার্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ততে॥

—বাসনা বৃদ্ধি পেলে কাম্যকর্মাদিতে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং কর্মে প্রবৃত্তি থেকে বাসনা বাড়তে থাকে। এই কারণে পুরুষের (জীবের) জন্মমরণ প্রবাহ আর কোনও কালে নিবৃত্ত হয় না। এই একই কথা 'জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী' শ্রীশ্রীমা বলেছেন সহজ ভাষায় কয়েকজন অতি সাধারণ মানুষের সামনে, যেখানে প্রথাগত শিক্ষার আলোটুকুও সেদিন পৌঁছয়নি। ''বাসনা হতেই তো দেহ।... একেবারে নির্বাসনা হলো, তো সব ফুরাল।... পারে না বলেই তো সৃষ্টি চলছে—পুনঃপুনঃ জন্মাচ্ছে।''[৬]

এই সংসারবন্ধন ছিন্ন করার উপায় হিসেবে শংকর বলেছেন—সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষণ, সর্বত্র, সকল উপায়ে 'সর্বব্রহ্মমাত্রাবলোকনৈঃ' সবকিছু ব্রহ্ম—এইরূপ দৃষ্টির ফলে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার ঐক্যভাবনা দৃঢ় হলে বাসনা, বিষয়চিন্তা এবং সকামকর্মের অনুষ্ঠান এই তিনটিই নষ্ট হয়ে যায়।[৭] আর মা বললেন, ''সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি।''[৮] ''বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ''—বাসনার বিনাশই মুক্তি। শংকরের জ্ঞানগর্ভ এইসব শ্লোকেরই যেন সরলীকৃত অর্থ শুনি মায়ের মুখে। ''নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।''[৯] এক্ষুণি কী হয়? মোক্ষ বা মুক্তিলাভ হয়।

ভাবলে বিস্ময় জাগে, যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়ার সুযোগটুকুমাত্র নিজ আগ্রহে অতি কষ্টে, প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে খুঁজে নিয়েছিলেন, সেই তিনি বেদ-বেদান্তের কঠিন

তত্ত্বকথা কত সহজ করে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করে সন্তানের হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিয়েছেন। কখনও গীতার বাণী হুবহু একই ভাষায় মাকে বলতে শোনা গেছে।

''বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥''৪।৫

—হে অর্জুন, হে শত্রুতাপন, তুমি আর আমি বহু জন্ম পার হয়ে এসেছি, সেগুলির বিষয় আমি সব জানি, তুমি জান না। মা-ও তাঁর সন্তানকে ঠিক এই কথাই বলেছেন। ''তোমার জন্ম জন্মের সব খবর আমি জানি, তুমি তো জান না। জন্মে জন্মে কত কি সব করেছ তা তুমি জান না, আমি জানি।''[১০]

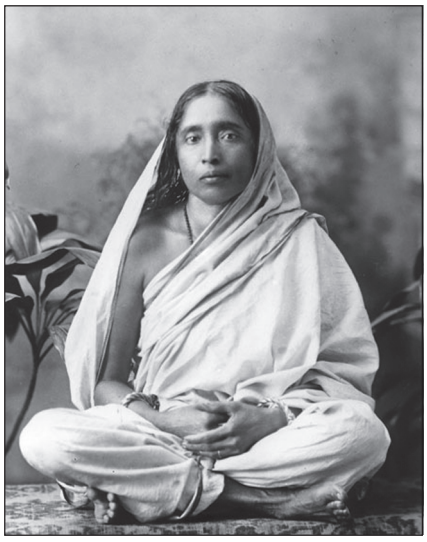

মা সন্তানের সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পেতেন। ভাল-মন্দ, সাধু-অসাধু—কত রকমের কত প্রকৃতির মানুষই এসেছে তাঁর কাছে। তাদের বিজাতীয় চিন্তাস্রোত মাকে সহস্রফণা সাপের মতো বেষ্টন করে কষ্ট দিয়েছে। অথচ নির্মল মাতৃহৃদয়ের কাছে সেসব যেন ধরা পড়েও ধরা পড়েনি। মায়ের স্বচ্ছ দিব্যদৃষ্টির সামনে সন্তানের কোনও কিছুই গোপন থাকেনি। সব সত্ত্বেও তিনি সন্তানের ভালটাই দেখেছেন। কারণ মায়ের দোষদৃষ্টি ছিল না। বলেছেন ''মানুষের কি দোষ দেখতে আছে। ওটি শিখিনি।''[১১] কৃপাময়ী মা জীবনভোর কেবলই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন সন্তানের কল্যাণের জন্য। হায়, এই একটি গুণ যদি আমরা জীবনে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হতাম!

জগতের আচার্যেরা যে-আলোকে আলোকিত শ্রীমা স্বয়ং সেই আলো। তাই সেখানে জ্ঞান কখনও নীরস বোধ হয়নি বা তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত হয়ে শুষ্ক তর্ক-বিতর্কের আকার নেয়নি। বরং মাতৃস্নেহের সুধায় তা স্নিগ্ধ করেছে সন্তানের জ্ঞানতৃষ্ণা। কত পাপী-তাপী, অভাগা-আতুর সে-জ্ঞানবারি পান করে অবলীলায় তরে গেছে ভবনদীর জোয়ার-ভাঁটা, কে তার হিসেব জানে!

''তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে''—জগদ্‌গুরুর এ-নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন মা। যদিও বলেছেন—''তিনি নিয়েছেন সব বাছা বাছা ছেলে কটি—তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে সব পিঁপড়ের সার!''[১২] অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত, সাংসারিক সুখে মজা, বিষয় সঞ্চয়ে মনোযোগী পিপীলিকার এই সারের জন্যই মায়ের দয়ার শেষ বা চিন্তার অবধি ছিল না। এরা কেউই ঈশ্বরকোটি বা অন্য কোনও দিব্যগুণ সম্পন্ন ছিল না। দোষে-গুণে ভরা অতি সাধারণ মানুষ তারা। কিন্তু তারা যখনই এসেছে মা দুহাত বাড়িয়ে তাদের গ্রহণ করেছেন। এরই মধ্যে কাউকে একটু ভাল দেখলে মা কতই না আনন্দিত হয়েছেন। অনেক সময়েই পরিচয় নেওয়া বা একটি কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করেননি। এমনকী যখন অতি অযোগ্য মানুষেরা তাঁর কাছে এসেছে, তিনি সে-ক্ষেত্রে শুধু দয়ার বশবর্তী হয়েই তাদের দীক্ষা দিয়েছেন। অতি অল্প ক্ষেত্রেই কাউকে ফেরাবার ইচ্ছা করেছেন। যদিও সে-ক্ষেত্রেও একটু কান্নাকাটিতেই তিনিই হার মেনে দীক্ষা দিয়েছেন।[১৩]

চোখের জলই সন্তানের অস্ত্র। কারণ কোমলপ্রাণ জননী সন্তানের চোখের জল দেখতে পারতেন না। ''দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়।''[১৪] তাঁর কৃপা পেতে শুধু একটু আন্তরিক চোখের জলই যথেষ্ট। সেখানে বয়স, কুল-শীল-জাতি-মান সবই গৌণ। তাই একটি ছোটছেলেকে দীক্ষার কথায় কেউ অনুযোগ করলে মা জানান, ''... কাল তো অমন করে পায়ে ধরে কাঁদলে। কে ভগবানের জন্য কাঁদছে বল দেখি? এ মতি কজনের হয়?''[১৫]

আবার কোয়ালপাড়ায় এক ভক্ত দীক্ষা নিতে এলে মা তাকে মন্ত্র দিতে অস্বীকার করেন। সে মার বাড়ির বাইরে রোদে বসে কাঁদতে থাকে। মা জানতে পেরে সেবককে বলেন, ''ও কেন এ রকম করে কাঁদছে? ওকে চলে যেতে বল।''—সন্তানের সেই অশ্রুধারার সঙ্গে তার চরিত্রের কতখানি কালিমা সেদিন ধুয়ে বার হয়েছিল আমরা জানি না। কিন্তু জানি 'করুণায় গড়া চিন্ময়ী তনু' মায়ের করুণা সেদিন সন্তানের চোখের জল দেখে দুকূল প্লাবিত করেছিল নিশ্চয়ই। তাই মা স্থির থাকতে না পেরে পরক্ষণেই সদর দরজা খুলে করুণামাখা দৃষ্টি দিয়ে সন্তানের সব তাপ শোষণ করে নিয়ে বলেছিলেন, ''বলে দাও, কাল ওর দীক্ষা হবে।''[১৬]

আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই পিঁপড়ের সারেরা যদি একদিন মায়ের কাছে না আসত, মা অস্থির ভাবে ঘর-বার করতেন। আর ঠাকুরকে বলতেন, ''কই ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাবে?''[১৭] বৃথা যেত না। কেউ না কেউ কৃপা পেতই। সন্তানের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ জননীর অপাপবিদ্ধ অঙ্গে বোলতার কামড়ের মতো জ্বালা ধরাত। সে-জ্বালা প্রশমিত করতে গঙ্গাজলে একাধিকবার মাকে পা ধুতে দেখা যেত। কখনও বলেও ফেলেছেন : ''এক একটা লোকের জ্বালায় ত্যক্ত হয়ে অনেক সময় মনে হয়, 'আর এ দেহ তো যাবেই, তা যাক না এক্ষুণি, দিয়ে দিই।' ''[১৮] অথচ বিষাক্ত জ্বালা-ধরানো হুলবিশিষ্ট এই সন্তানদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা বা কোনও অনুযোগ করা চলত না। কারণ সঙ্গে সঙ্গে পতিতোদ্ধারিণীর কণ্ঠে শোনা যেত, ''কেন গো? ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন?''[১৯] রসগোল্লা খেতে আসেননি বলেই অকাতরে কৃপা করে গেছেন তাঁরা। যে-বিষ শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধচিত্ত ছেলেরা গ্রহণ করতে পারতেন না, তা অবলীলায় মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অপার করুণায় জননী তাদের সকলকেই সমান আদরে কোলে স্থান দিতেন। কখনও ''আমি জন্মজন্মান্তরে যা কিছু পাপ করেচি সব তোমাকে অর্পণ করলুম''[২০]—এই সম্প্রদানবাক্য পাঠ করিয়েও মা বহু সন্তানের মধ্যে চৈতন্য সঞ্চার করে দিয়েছেন। পরিবর্তে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করেছেন তাদের জন্মজন্মান্তরের পাপ-তাপ। এক্ষেত্রেও ভাগ্যবান অনুযোগকারী ধন্য হয়েছেন মায়ের নিজের মুখে তাঁর ঐশীশক্তির কথা শুনে। ''আমরা পাপতাপ না নিলে আর নেবে কে? আমরাই পাপ হজম কত্তে পারি, আমরা তো সেই জন্যেই এসেচি!''[২১]

কীজন্য এসেছেন, কী করতে হবে, কতটুকু করতে হবে জানতেন বলেই ভাগবতী তনুতে রোগ গ্রহণ করে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করেছেন অবলীলায়। বলেছেন, ''মন্ত্র দেওয়া কি চারটিখানি কথা! কত বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হয়। কত চিন্তা তাদের জন্য করতে হয়।''[২২] সে-চিন্তা সন্তানের ইহলোক-পরলোক উভয়েরই। প্রার্থনা করেছেন, ''ঠাকুর তুমি এদের ইহ-পরকাল রক্ষা কর।'' জননী শুধু দেওয়ার জন্যই কাঙাল, বিনিময়ে কিছুই চাননি কোনওদিন। সারাদিন সন্তানদের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছেন। এমনকী তাদের চলার পথের নুড়ি-কাঁকড়টি পর্যন্ত সরিয়েছেন নিজের হাতে, রাতের অন্ধকারে সকলের চোখের আড়ালে। আবার তাদেরই জন্য রাত জেগে জপও করেছেন।

কারণ তাদের অধিকাংশই প্রায় নিয়মিত বা কেউ কিছুই জপ করে না। কল্যাণময়ী জননী রাতে স্বস্তিতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেন না এই ভেবে— ''মনে হয় যতক্ষণ ঘুমুব, ততক্ষণ জপ করলে জীবের কল্যাণ হবে।... যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের তো আর ফেলতে পারি নে।''[২৩] এই 'না ফেলতে পারা'টা যে কী ছিল তা কেবল তিনিই জানতেন। ভাগ্যবান সন্তান মায়ের প্রাণের কথাটি শুনেছিলেন, ''বাবা, তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে, আমার বুকে শেল বাজে।''[২৪]

সন্তানের জন্য তাই তাঁর নিত্যনতুন বিধান। কোনও সন্তানের হাতে বাত। তাই কল্যাণময়ী জননী ঠিক করে দিলেন, ''তোমার তো বাবা করজপ হবে না, ২৫টা রুদ্রাক্ষ দিয়ে মালা করে নিয়ো, দিনে সেই মালা একবার করে জপ করবে আর ঠাকুরকে ভক্তি করবে।''[২৫] গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করলে প্রত্যবায় হয়। তাই মা যেটুকু না করলেই নয় সন্তানকে সেরকমই বিধান দিতেন। কাউকে হয়ত জননী একশো আট বার জপের বিধান দিয়েছেন। তা শুনে সেই সন্তান হয়তো বিস্ময় প্রকাশ করেছে, ''মোটে ১০৮?'' মা সন্তানের দম্ভোক্তির দিকে দৃক্‌পাত না করে সহজ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছেন, ''হ্যাঁ বাবা; আমার কাছে ওরকম বোলো না।''[২৬] আবার কখনও কোনও সন্তান সংসারাতীত আনন্দের জন্য প্রার্থনা করেছে। জননীও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ছেলেকে আশ্বস্ত করেছেন, ''বাবা সব হবে, সব পাবে; ব্যস্ত হয়ো না।'' মায়ের কথায় চরম বিশ্বাস রেখেও ছেলে আবদার করেছে, ''মা, তা তো বুঝি, পাঁচ মিনিটের জন্য কি হয় না? তা হলে তো বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কী।''[২৭] সন্তানের ব্যাকুলতার মূল্য দিয়ে জননী তার মাথায় হাত রেখে জপ করে অন্য কাজে চলে গেছেন। সন্তানের সামনে জগৎ তখন মা-ময়। সিদ্ধির নেশার মতো একটা ঘোর। মাত্র কয়েক মিনিট, ঘড়ির কাঁটা ধরে হয়তো পাঁচ মিনিটই!

জননী সদা সতর্ক থাকতেন কোনও সন্তান যেন এতটুকুও অতৃপ্তি নিয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে না যায়। তাই সন্তানের কত ছোটখাট আবদার কী গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে মা পড়ে নিতেন! কেউ ভেবেছে, মা যদি আমার দিকে একটু ঘুরে বসেন, কোনও সন্তানের মনে হয়তো মায়ের শ্রীপাদপদ্মে একটু ফুল দেওয়ার বাসনা জেগেছে, কেউ ভেবেছে, মা যদি খেতে খেতে একটু সন্দেশ ভেঙে দেন তো জানব মা আমাকে খুব ভালবাসেন, —এসবই সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করে মা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাদের অন্তরের কতখানি কাছে জননীর অবস্থান। নিজের প্রাত্যহিক নিয়মনিষ্ঠাতেও মা সন্তানের জন্য ব্যত্যয় ঘটাতেন। নবদীক্ষিত এক সন্তান ভোররাত্রে রওনা হবে। মনে বাসনা, মা যদি খেতে খেতে তাকে একটু প্রসাদ দেন। প্রণাম করতেই মা তাকে দাঁড়াতে বলে ঘর থেকে ছোট থালায় মুড়ি এনে দুই এক মুঠো মুখে ফেলে, মুখের কিছু মুড়ি থালায় দিয়ে জানতে চেয়েছেন, ''এবার তো হয়েছে?''[২৮]

এত করেও কৃপাময়ীর মুখে শোনা যেত আক্ষেপোক্তি। ''এক একবার মনে হয়, এই শরীরটুকু না হয়ে একটা খুব বড় শরীর হতো, তা হলে কত জীবেরই না কল্যাণ হতো!''[২৯]

এরই মধ্যে শুদ্ধচিত্ত কিছু সন্তান এসে মাকে খানিক শান্তি-স্বস্তি দিয়েছেন। মায়ের যথার্থ অর্থে প্রাণঢালা সেবা করেও সন্তান যেন মনে শীতলতা অনুভব করতে পারছিলেন না। মাকে আরও স্বস্তি, আরও একটু তৃপ্তি কীভাবে দেওয়া যায় এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল। তখনই মা কাছে ডেকে নিয়েছেন সেই সন্তানকে। সন্তানও অবলীলায় জামা খুলে মায়ের খুব কাছটিতে বসে মায়ের জ্বরগায়ের গরম হাতটি নিজের ঠান্ডা বুকে পিঠে দিয়ে মাকে স্বস্তি দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ-দৃশ্য তো

আজ ধ্যানের বিষয়! সেদিন কে বেশি ঠান্ডা হয়েছিলেন—মা, না সন্তান, কে বলবে!

মা কৃপা করে সেই সব সন্তানের হৃৎপদ্ম ফুটিয়ে মনের আঁধার ঘুচিয়ে দিয়েছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের একটি উপলব্ধির কথা বলেছিলেন, ''তখনও মাকে দেখি নি, দেখতে গিয়েচি; মা উপরে রয়েচেন, আমি নীচের তলায় বসে—আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল!''[৩০]

আবার কখনও এইসকল শুদ্ধচিত্ত ব্যাকুলহৃদয়-সন্তানকে দীক্ষা দিয়ে একটু স্পর্শ করেই দেখিয়ে দিয়েছেন, ''এই দেখ। এই তোমার ইষ্ট, কেমন? এঁকেই তো বরাবর ধ্যান করে এসেচ?''[৩১] আসলে কল্যাণময়ী জননী কঙ্কণপরা যে-হাতে সন্তানকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করেছেন, সেই হাতে অনায়াসেই ভক্তি-মুক্তি দিয়েছেন এবং দিয়ে থাকেন। তাই অবলীলায় হাত নেড়ে বলতে পেরেছেন, ''মুক্তি তো যখন তখন দেওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিটুকু ভগবান দিতে চান না। ভক্তি দিলেই যে ভক্তের কাছে বাঁধা পড়েন!''[৩২]

ভক্তিতে তোমায় বাঁধব, সে-ভক্তি এ অধমকে দাওনি। তুমি ইচ্ছাময়ী, এই জীবন-মাঝে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করো। শুধু ব্যাকুলপ্রাণের একটি বিনীত নিবেদন : শরণাগতি দাও আর আমার আমিটিকে তোমার পূত পাদগঙ্গায় শুদ্ধ করে নাও।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ১০২

২। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, *শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০২), পৃঃ ১৮৫ [এরপর, *শ্রীশ্রীমা* সারদামণি দেবী]

৩। দ্রঃ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *শ্রীশ্রীসারদাদেবী* (ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাঃ লিমিটেড : কলকাতা, ১৪১৫), পৃঃ ১৬৪ [এরপর, *শ্রীশ্রীসারদাদেবী*]

৪। তদেব

৫। তদেব

৬। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), অখণ্ড, পৃঃ ২০২-০৩ [এরপর, *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*]

৭। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, অনুবাদক স্বামী বেদান্তানন্দ, *বিবেকচূড়ামণি* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭২) পৃঃ ২১৬-১৮

৮। তদেব, পৃঃ ৬৩

৯। তদেব, পৃঃ ২৯৬

১০। *শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী*, পৃঃ ১৮৯

১১। তদেব, পৃঃ ১৯৩

১২। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ৩৪৯

১৩। দ্রঃ *শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী*, পৃঃ ১৮৭-৮৮

১৪। তদেব, পৃঃ ১৯০

১৫। *শ্রীমা সারদা দেবী*, পৃঃ ৩১৮

১৬। *শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী*, পৃঃ ১৮৮

১৭। *শ্রীমা সারদা দেবী*, পৃঃ ৩০৭

১৮। *শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী*, পৃঃ ১৮৯

১৯। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ৭৮

২০। *শ্রীশ্রীসারদাদেবী*, পৃঃ ১৬১

২১। তদেব, পৃঃ ১৬২

২২। *শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী*, পৃঃ ১৮৫

২৩। তদেব, পৃঃ ১৮৬-৮৭

২৪। তদেব, পৃঃ ১৮৭

২৫। *শ্রীশ্রীসারদাদেবী*, পৃঃ ১৬৫

২৬। তদেব, পৃঃ ১৬৬

২৭। তদেব, পৃঃ ১৬৮

২৮। *শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী*, পৃঃ ২০১

২৯। তদেব, পৃঃ ১৮৯

৩০। *শ্রীশ্রীসারদাদেবী*, পৃঃ ১৬৯

৩১। তদেব, পৃঃ ১৬৭

৩২। তদেব, পৃঃ ১৬৬